মাদার টেরিজা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ কথামুখ ॥

এক একটি জীবন মানুষের মর্মমূল ধরে দেয় টান। মাদার টেরিজা এমনই এক জীবন। যেসব বিদেশি ভারত পথিক এই দেশকে প্রাণের টানে আপন করে নিয়ে, এই দেশের জন্যই জীবন উৎসর্গ করেছেন, মাদার টেরিজা তাঁদেরই অন্যতম। জীবন যাপনে এবং দীন-দরিদ্র মানুষের প্রতি প্রেম-বিতরণে মাদার টেরিজার সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁরও আগে এদেশে আসা ভগিনী নিবেদিতার। স্বামী বিবেকানন্দর আহ্বানে নিবেদিতা এদেশে এসেছিলেন। এদেশের মানুষকে ভালোবেসে এদেশেই কাজ করে শেষ নিশ্বাস তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন এদেশেরই বাতাসে। আর মাদার টেরিজা অনন্তর আহ্বান শুনে—প্রভু যিশুর ডাকে সাড়া দিয়ে এদেশে আসেন। এদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে এদেশের দীন-দরিদ্রের কল্যাণে কাজ শুরু করেন। তারপর এদিন দেশের সীমা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের গরিব আর্ত আর দুঃস্থদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। উন্নীত হন বিশ্বজননীতে। তাঁর এই বিরাট জীবন মাতৃত্বে—মহত্বে সুবিশাল এই আকাশেরই মতো। তাই তাঁর জীবনকথা কালির আখরে ধরা খুবই দুরূহ। তাঁকে যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে তাঁর জীবনকথা লিখেছেন, তাঁদের রচনা হাতের কাছে ছিল বলেই এই মালা গাঁথার প্রয়াস এবং সে-কারণেই, লে, জলি, ডেসমন্ড ডয়েগ, ম্যালকম ম্যাগরিজ, সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সুদেব রায়চৌধুরীর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁদের রচনা ছাড়া এই মালা গাঁথা হয়তো সম্পূর্ণ হত না কোনো মতেই।

দেশবিদেশের মহাজীবনকে আজকের প্রজন্মের কাছে তুলে

ধরার একটি আদর্শ প্রয়াস নিয়েছেন শ্রীশংকরীভূষণ নায়ক। সেই প্রকল্প অনুযায়ীই বইটি লেখা। এই সুযোগ পাওয়ার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানাব তাঁকে। এইভাবে আর যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ আমি। বইটি যাঁদের জন্য লেখা তাঁদের ভালো লাগলে সার্থক হবে শ্রম। অলমিতি—

বইমেলা ২০০৪ নন্দলাল ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

অবতরণিকা	১১
টেরিজার ছেলেবেলা ও বাবা-মা	১৫
ঘর ছাড়লেন মা	২৩
সিস্টার টেরিজার কর্মকাণ্ড (প্রথম পর্ব)	২৭
সিস্টার থেকে মাদার টেরিজার কর্মকাণ্ড (দ্বিতীয় পর্ব)	৪৮
গড়ে উঠল প্রতিষ্ঠান	৬৫
মাদারের কর্মধারার আরেক পর্ব	৭৯
শিশুরাই যিশু	৯৭
ব্রাদারদেরও সঙ্গে নিলেন	১১৪
গুণমুগ্ধের দৃষ্টিতে মা	১১৭
নানা পুরস্কারে ভূষিতা মাদার	১২৩
মায়ের মহাপ্রয়াণ	১৩৭
জীবনপঞ্জি	১৪১

॥ অবতরণিকা ॥

ভালোবাসো। ভালোবাসো মানুষকে। ভালোবাসার চেয়ে মহত্তর আর কোনো মন্ত্র নেই। মানুষকে ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই তুমি পাবে ঈশ্বরের ভালোবাসা। পাবে তাঁর করুণা। পাবে তাঁর সান্নিধ্য। ঈশ্বরের সন্তান তুমি। তুমি অমৃতের সন্তান। ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সেই অমৃতে মিশে যাবে তুমি।

আজ থেকে দু-হাজার বছরের অধিককাল আগে এই ভালোবাসার মূল্য চুকিয়েছিলেন যিশুখ্রিস্ট নিজের জীবন দিয়ে। ঘৃণা আর বিশ্বাসঘাতকতা অবসান ঘটিয়েছিল জীবনের। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী সে জীবনের বাণীই পরিব্যাপ্ত হল বিশ্বে।

যিশুখ্রিস্ট মানবপ্রেমকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বপ্রেমে। ভালোবাসা আর শান্তির বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি দিয়েছিলেন অমৃতের সন্ধান। কিন্তু অমৃতের সন্তানরা বহু সময়ই অমৃতের পাত্রকে দূরে সরিয়ে রেখে হাত তুলে নিয়েছে হলাহল। ভালোবাসা নয়, ঘৃণা আর অত্যাচারে জর্জরিত করেছে মানুষকে। অথবা জর্জরিত হয়েছে তারা নিজেরাই।

এ কোনো বিশেষ সময় বা যুগে নয়। এমন ঘটনা ঘটেছে বারেবারেই। এই ভারতেই যারা এসেছিল একদিন বণিকের বেশে, তারা এদেশের মানুষেরই লোভকে আশ্রয় করে বসে পড়ল রাজার সিংহাসনে। সিংহাসনে বসে তারা হিংস্র হয়ে উঠল নেকড়ের মতোই। তাদের হাত পায়ের তীক্ষ্ণ নখে হৃৎপিণ্ড হতে থাকল ভোরের সূর্যের মতোই লাল।

কিন্তু এই তো সব সত্য নয়। সেই দস্যুর দলই তো তাদের জাতির সবাই নয়। তাই একদিকে চলছিল যখন অত্যাচার, সেই তখনও—

সমুদ্র পাড়ে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা;
সকালে সন্ধ্যায়, দয়াময় দেবতার নামে;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে;
কবির সংগীতে বেজে উঠেছিল
সুন্দরের আরাধনা।

এই সুন্দরের আরাধনা চলছিল বলেই, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতক থেকে ইউরোপ মানবজাতির উপর যে অত্যাচার চালিয়েছে—সে পাপের সমুদ্রে তাদের ভরাডুবি হয়নি। সেই সত্যসুন্দরই তাদের অস্তিত্বকে অপরিহার্য করে তুলেছে।

যিশুখ্রিস্টের ধর্মে দীক্ষিত ইউরোপ এদেশের বুকে শুধুই রক্তাক্ত কামড় বসায়নি, তারা এনেছে আধুনিক জ্ঞান অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোও। সে আলো আবার আমাদের নতুন করে সবকিছু দেখতে শিখিয়েছে। আর সেই দেখার সূত্রেই আজ বলা যায়, অন্ধকার এবং আলোর মতো 'ছোটো ইংরেজ' এবং 'বড়ো ইংরেজ'-এর যুগল রূপ ছিল বলেই ইংরেজ তথা ইউরোপ আজ

আব শুধুই ঘৃণার পাত্র নয়। সাদা ও কালোর মতো, দিন ও রাত্রির মতো তাদের অত্যাচার ও ভালোবাসা দুয়ের সঙ্গেই আমরা পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি এবং আজও পাচ্ছি।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত শাসনের নামে এদেশে শোষণের যে রথ চালিয়েছিল ইংরেজের তা দেখে বারেবারেই প্রশ্ন জেগেছে মনে, তাহলে প্রভু যিশুর প্রেমের বাণী কী তাঁরই ধর্মের এই অনুগামীদের মনে কোনো রেখাপাতই করেনি? ক্লাইভ-হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিশ ওয়েলেসলি-লিটন প্রভৃতির অত্যাচারটাই কী তাহলে শেষকথা? বৃথাই কী তালে যিশুর জীবনদান? রক্ত ঝরানো? ইংরেজ তথা ইউরোপীয়দের কাছে খ্রিস্টধর্ম কী তাহলে শুধুই একটি আচরণীয় বস্তু? মনের মধ্যে ঠাঁই পায়নি সেই ধর্মের মর্মকথা?

'ছোটো ইংরেজ' সংখ্যা বেশি হলেও যে অল্প সংখ্যক 'বড়ো ইংরেজ' বা মহান ইউরোপীয় তাঁদের ভালোবাসা—বিশ্ব মানবিকতা দিয়ে আমাদের অবাক করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন 'দীনবন্ধু' চার্লস অ্যানড্রুজ, ভগিনী নিবেদিতা এবং মাদার টেরিজা। এঁরা বিভিন্ন সময়ে এদেশে এসেছেন। ভালোবেসেছেন এদেশের মানুষকে। এই দেশকেই নিজেদের স্বদেশ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এই দেশের মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেদের জীবনকে জড়িয়ে নিয়েছেন। প্রেম-ভালোবাসা নিঃস্বার্থ সেবা দিয়ে তাঁরা এক মহত্তর রূপে উদ্ভাসিত হয়েছেন। সেইসঙ্গে তাঁদেরই দেশবাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্তও করে গেছেন।

ভারত অনুরাগিণী ভারতে এলেন মাদার টেরিজা। শুধু আসা নয়, ভারতকে স্বদেশজ্ঞানে তিনি স্বাধীন এই দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে এদেশের মানুষের হিতে— তাদের কল্যাণে—তাদের সেবাতেই ব্যয় করেন সারাটা জীবন।

ইউরোপীয়রা এদেশে প্রথম এসেছিল বাণিজ্য করতে। অথবা বাণিজ্যের নামে এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করতে। সেই লুণ্ঠনের পথেই ইংরেজরা একদিন এদেশের রাজা হয়ে বসেছিল। এ সবই ইতিহাস। সেই ইতিহাসের ধারাতেই বণিক ইংরেজ— শাসক ইংরেজের পেছন পেছনই এসেছিল ধর্মপ্রচারক মিশনারি ইংরেজ। অবশ্য একা ইংরেজ নয়। সেই লক্ষ্যে এদেশে আসে ইউরোপের অন্যান্য দেশের ধর্মযাজকরাও।

সেইসব ধর্মযাজকের অনেকেই এদেশের মানুষের সেবাতেই জীবন ব্যয় করেছেন। আবার অনেকেরই সাদা আলখাল্লার আড়ালে ছিল একটি লোভী-লুণ্ঠনকারীর মুখ। তারা এদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে ধর্মপ্রচারের নামে নিজেদের শাসন-ব্যবস্থাটি কায়েম রাখার কাজও করে গেছেন। সেবার নামে, শিক্ষাবিস্তারের নামে, প্রলোভনের নানা জাল বিছিয়ে এদেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছেন। ধর্মের ভিত্তিতে এদেশের বহু মানুষকে রাজার জাতে সামিল করে রাজার রথচলার পথটি সুগম করার ব্যবস্থাও করেছেন। স্বভাবতই ইউরোপীয় ধর্মযাজকদের সম্পর্কে এদেশের মানুষের মনে একটা সন্দেহ থেকেই গেছে। ফলে যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে একনিষ্ঠ হয়ে মানুষের সেবা করে গেছেন তাঁরাও কখনো সখনো মানুষের সেই সন্দেহের শরে বিদ্ধ হয়েছেন।

মাদার টেরিজাও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর কাজকেও সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে বহু সময়ই। আবার সেই সন্দেহের কালোছায়া সরে যাবার পর মাদারের প্রকৃত চেহারাটা দেখে লজ্জা পেয়েছে ভারতের মানুষ। চেয়েছে ক্ষমা। আর স্মিত হাস্যময়ী মাদার সেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাবার সাধনাতেই করে গেছেন তাঁর কাজ। আজীবন এবং তার পরেও।

॥ টেরিজার ছেলেবেলা ও বাবা-মা ॥

হঠাৎ-ই নিভে গেল আলো। ঝুপ করে নেমে এল একরাশ অন্ধকার। ওরা তিন ভাইবোন সেই ঘন অন্ধকারে যেন তলিয়ে যেতে থাকে। সেই তলিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে ওরা শোনে ওদের মায়ের কণ্ঠ। নির্ভরতায়, নিশ্চয়তায় ওরা যেন প্রাণ ফিরে পায়।

ওরা বলতে অ্যাগনেস আর তার দাদা-দিদি ল্যাজার ও অ্যাগে। সন্ধের পর পড়তে বসেছিল তিনজনে। পড়তে পড়তে গল্প। আর তাতেই কখন যে এক শিক্ষিকাকে নিয়ে মেতে উঠেছিল তা ওরাও জানে না। মুখরোচক সে আলোচনা। পড়া নিয়ে কথা উঠলেও একসময় শিক্ষিকাটির চারিত্রিক বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনায় মুখর তারা। আর তখনই নিভে যায় আলো।

প্রথমটায় একটু ভয়ই পেয়েছিল। তারপর আলোটা খারাপ হয়েছে কিনা তা দেখতে থাকে তারা। আর সেই সময়ই মা ড্রানালির বার্ণেই বলে ওঠেন, ভয় নেই, আলোটা খারাপ হয়নি। ওটা নিভিয়ে দিয়েছি আমিই।